IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

লালনের গানে আত্মতত্ত্বের খোঁজ

Theory of Personal Identity in Lalon Song

[1]তাপস দাস
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, শহীদ নূরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ **(Abstract):**
আমি কে? আমার স্বরূপ কী? আমার সৃষ্টি কিভাবে? স্রষ্টার সাথে আমার সম্পর্ক কি? ইত্যাদি নানা আদিবিদ্যক প্রশ্ন দর্শন চর্চার ইতিহাসে স্থান কাল পাত্রভেদে কখন জড়বাদী বা অধ্যাত্মবাদী কিংবা অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে না না ভাবে আলোচিত হয়ছে। তবে আত্মপরিচয় সংক্রান্ত আলোচনায় এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কোনোটি সার্বিকতার দৃষ্টিভঙ্গি হতে এই সমস্যাকে পর্যালোচনা করেনি। বরং একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি হতেই তারা তাদের নিজস্ব মতকে উপস্থাপন করেছে। ফলতঃ সমস্যাটি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। তাই এই গবেষণা প্রবন্ধে এই সমস্যা হতে উত্তরণের মাধ্যম স্বরূপ লালন দর্শনের পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তা করতে গিয়েই এখানে বাউলগান ও তার অর্ন্তনিহিত গূঢ় তত্ত্বকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এখানে খোঁজ করা হয়েছে বাউলগানে বর্ণিত অনামক সত্তা স্বরূপ 'অচিন পাখি', 'মনের মানুষ'-এর স্বরূপকে। পর্যালোচনা করা হয়েছে লালন দর্শনের উৎপত্তিতে সূফী ও সহজিয়া সাধনার প্রভাবকে। সর্বপরি আলোচনা করা হয়েছে লোকাত্তর দর্শন হিসাবে লালন দর্শন কিভাবে জড়বাদী এবং অধ্যাত্মবাদী কিংবা অদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে স্বতন্ত্র তার তাৎপর্যকে।

বিষয়সূচক শব্দ **(Index Term):** আমার স্বরূপ, জড়বাদ, অধ্যাত্মবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, লালন দর্শন, সূফী, সহজিয়া, অচিন পাখি, মনের মানুষ।

সূচনা (Introduction)

'খুজি যারে আসমান জমি
আমারে চিনিলে আমি
এ বিষম ভ্রমে ভ্রমি
আমি কোনজন সে কোনজনা'।[১]

দর্শন চর্চার ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে দার্শনিকগন যে চিরন্তন শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান করেছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হল আত্মপরিচয় সংক্রান্ত অনুসন্ধান। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে এই দর্শন চর্চা আবর্তিত হয়েছে তা হ'ল- আমি কে? আমার স্বরূপ কী? আমার সৃষ্টি কিভাবে? স্রষ্টার সাথে আমার সম্পর্ক কি? ইত্যাদি আদিবিদ্যক প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এখানে মূলতঃ দুটি দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায়; যথা জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। জড়বাদী দার্শনিকগন চৈতন্যের আধার হিসাবে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনো সত্তাকে স্বীকার করেনি। এখানে দেহকেই চেতনার আধার হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চার্বাক দর্শনের কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতিতে, সাবেকী দর্শনের আঙ্গিকে একমাত্র চার্বাক দর্শনে দেহাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে 'আমার স্বরূপ'কে ব্যাখ্যা করেছে। প্রতক্ষ্য প্রমাণবাদী চার্বাকমতে দেহ প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায় দেহের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করতে হয়। কিন্তু দেহ অতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে আত্মা কোনো ভাবেই প্রতক্ষ যোগ্য নয়। তাই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অসৎ। প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী চার্বাক মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ- ভূতচতুষ্ঠয়ের আপন স্বভাব বশতঃ বিশেষ সংমিশ্রণের মধ্যদিয়ে যখন দেহ গঠিত হয় তখন তাতে চৈতন্যের অবির্ভাব ঘটে। আর এই চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই হল আত্মা। অর্থাৎ আমি কে? এই প্রশ্নে ভূতচৈতন্যবাদী চার্বকদের সিদ্ধান্ত হল- আমার দেহই হল আমি। এখন প্রশ্ন– 'আমার দেহ' ও 'আমি' যদি অভিন্ন হই তাহলে দেহটাকে কেন 'আমার দেহ' বলি? এই প্রশ্নের উত্তরে চার্বাকগন 'রাহু' ও 'রাহুর মস্তক'এর উপমা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের দাবী 'রাহু' যেমন 'রাহুর মস্তক' অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনি 'আমি'ও, 'আমার দেহ' অতিরিক্ত কিছু নয়। তবে এই দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। এ শরীরে যা কিছু আছে তা সবই আমার হলেও তা আমি নই। অর্থাৎ 'দেহ'টি হল 'আমার দেহ' কিন্তু দেহটি 'আমি' নই। আসলে দেহকে আমি বলে স্বীকার করলে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, - ইত্যাদির

ন্যায় অধ্যাত্মবাদ স্বীকৃত তত্ত্বগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না তাই অধ্যাত্মবাদীগন আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে ভূতচৈতন্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে মান্যতা দেয়নি। এখন প্রশ্ন, তাহলে অধ্যাত্মবাদী মতে 'আমার স্বরূপ' কী? কে আমি? অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগন 'আমি' বলতে দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা রূপে আত্মাকে স্বীকার করেছেন; যার বর্ণনা আমরা গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে পাই। বৈদিক সহিত্য অনুসারে দেহের উৎপত্তি ও বিকাশ থাকায় দেহ অনিত্য। কিন্তু আত্মা উৎপত্তি বিনাশ রহিত নিত্য সত্তা। আর এই উৎপত্তি বিনাশ রহিত নিত্য সত্তাকেই অধ্যাত্মবাদীগন 'আমার স্বরূপ' বলেছেন।
এখন ভালো করে বিচার করলে দেখা যাবে দেহকে যেমন 'আমার স্বরূপ' বলে দাবী করা যায় না, তেমনি দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় দেহোত্তর আত্মাকেও 'আমি' পদের বাচ্যার্থ বলে স্বীকার করা যায় না। ফলত এখন প্রশ্ন আসে- তাহলে আমি কে? আমার স্বরূপ কী? এখন এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এখানে লালন দর্শনকে অবলম্বন করা হয়েছে।

২. গবেষণার লক্ষ্য (Aim of the research)

লালন দর্শনের প্রেক্ষাপটে স্বরূপের সন্ধান করা এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। আসলে স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনায় ধ্রুপদী দর্শনে যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয়েছে তা পরস্পর বিরোধী এক একাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এই একপক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে স্ব-রূপ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন, তাহলে এই সংকট হতে উত্তরণ কিভাবে সম্ভব? উক্ত প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের সাবেকী বা চিরাচরিত দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে আসতে হবে। আমাদের রাজপথ অতিক্রম করে গলিপথে অগ্রসর হতে হবে। যার দিক নির্দেশ আমরা পাই বাউল-ফকির-সূফী দর্শনের অলোচনায়। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে যদিও তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে; তবে বৃহৎ প্রেক্ষাপটে এই তিনের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আছে। যে যোগসূত্র বর্ণিত হয়েছে লালনের দর্শনে। তাই আত্মপরিচয়ের সার্বিক রূপ অনুসন্ধানে এখানে 'লালন দর্শন' পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩. গবেষণার প্রকরণ পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণাপত্রটি মূলতঃ বর্ণনামূলক। এখানে লালন সাঁইজীর দর্শনের প্রেক্ষাপটে 'স্ব-রূপ'কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণার লক্ষ্য আলোচনার মধ্যদিয়ে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই গবেষণা পত্রে যে প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে তা হল।
১. 'আমার স্বরূপ' কী?
২. 'আমি কি দেহ স্বরূপ? না কী দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান সত্তা স্বরূপ?
৩. দেহের সাথে আত্মার সম্বন্ধ কীরূপ?
৪. দেহ সম্পৃক্ত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ কীভাবে সম্ভব?
এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানে এখানে মাঠ পর্যায়ে কোনো স্বাক্ষাৎকার কিংবা সামাজিক জরিপ মূলক পদ্ধতি দ্বারা লব্ধ কোনো প্রকার প্রাথমিক তথ্যকে গ্রহণ করা হয়নি। বরং এখানে উক্ত অধ্যায়নের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত তথ্য অনুসন্ধানে লালন সাঁইজীর গানের মর্মার্থ ও দর্শনকে ভিত্তি করে লেখা গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তথ্যের অনুসন্ধানে এখানে সাহিত্যগত পর্যলোচনাকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এই বিচারে এখানে উপস্থাপিত তথ্যগুলি মূলতঃ গৌণ তথ্য। এবং এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলির বিশ্লেষণে পরিমানগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে গুণগত অধ্যায়ন পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. স্বরূপ প্রসঙ্গে লালন সাঁইয়ের অভিমত

ইতিপূর্বেই একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্ব-রূপের সন্ধানে এখানে লালন দর্শনকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা করতে গিয়েই এখানে 'মনের মানুষ'এর অনুসন্ধান করা হয়েছে। যে মনের মানুষের সন্ধানে বাউলগন হয়েছে ক্ষ্যাপা, পাগল পারা। সে ছেড়েছে ঘড়-সংসার, ছিন্ন করেছে পারিবারিক/সাংসারিক বন্ধন। মনের মানুষকে নিয়ে লালনের যে ব্যকুলতা তা সর্বদাই প্রকাশ পায় তার গানের ভাব-চেতনায়। কাজেই বলা যায়, লালন দর্শনের একটি অন্যতম অঙ্গ হল 'মনের মানুষ'-এর স্বরূপ অনুসন্ধান। এখন প্রশ্ন কে এই মনের মানুষ? কি তার স্বরূপ? উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমাদের লালন ও তার দর্শন সম্বন্ধে প্রাথমিক কিছু জ্ঞানান্বেষণ করা একান্ত আবশ্যক। ফলতঃ এখন প্রশ্ন আসে লালন কে?

৪.১. লালন সাঁইজীর পরিচয়

বাংলার লোককৃষ্টির রেঁণেসা পুরুষ হলেন ফকির লালন সাঁই। যিনি লোক মুখে লালন সাঁই দরবেশ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্মের স্থান, তারিখ, পিতৃপরিচয়, বংশ পরিচয়, জাত ধর্ম পরিচয় সব নিয়েই নানা মুনির নানা মত এখনো প্রচলিত আছে। কেউ তাকে মুসলিম ভাবে, আবার কারো কাছে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব[২]। যদিও লালন নিজে জাতধর্মের পরিচয় নিয়ে উদাসিন ছিলেন; তাই গালের সুরে তিনি বলেন-

'সব লোকেকয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কিরূপ
দেখলাম না এই নজরে'[৩]

আবার অন্যত্র তিনি বলছেন-

'সবে বলে লালন ফকির
হিন্দু কি যবন
লালন বলে আমার আমি
না জানি সন্ধান'[৪]

আসলে লালনের জাত-ধর্ম- পরিচয় নিয়ে তৎকালিন সমাজের কৌতুহল ছিল চরম। ব্যতিক্রম আজও নয়। আজ লালনের গানের মধ্যদিয়ে বাউলগান যে সাহিত্যগত উৎকর্ষতা লাভ করেছে তার ক্ষির চেটেপুটে খাওয়ার জন্য এলিট ক্লাস সর্বদাই ব্যস্ত। তাই তাকে কখনো হিন্দু বা কখনো মুসলিম বলে প্রমাণ করার এক ঘৃণ্যচক্রান্ত এখনও করা হচ্ছে। কিন্তু লালনকে গঙ্গায় চুবিয়ে যেমন হিন্দু করা যাবেনা, তেমনি দরগায় নিয়ে গিয়ে মুসলমান করা যায় না। তিনি ছিলেন মুক্ত মানবতাবাদের প্রচারক, যেকিনা প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সামাজিক গতানুগতিকতার বিপ্রতিপে দাঁড়িয়ে সহজিয়া দর্শনের কথা বলেছেন। বলেছেন- 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে বলে মানুষ রতন'। আজ এলিট সমাজ 'মানবাধিকার'-এর যে ধারণা পোষণ করেন লালন তাঁর গানের ভাষায় তা বহু যুগ আগেই তা প্রচার করেছেন। তিনি ঈশ্বর সাধনার উর্দ্ধে উঠে 'আলেক মানুষ', 'মনের মানুষ'-এর সাধনা করেছেন, যা তৎকালিন কেন এ সমাজেও মোটেই সহজ নয়। সহজ নয় সরল ভাবে একথা বলা- 'সব সৃষ্টি যে করেছে, তার সৃষ্টি কে করেছে, সৃষ্টি ছাড়া কী রূপে সে সৃষ্টিকর্তা নাম ধরেছে' বা সহজ নয় এই পংক্তি সৃষ্টি করা- 'অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাই শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই'। অর্থাৎ লালন যে মানবকেই সাধনার প্রথম সোপান বলে স্বীকার করেছিলেন সে কথা বলাইবাহুল্য। তিনি মানুষকে জাত-ধর্ম-বর্ণ ভেদ হতে মুক্ত করে পরমসত্যের অনুসন্ধানে করেছিলেন সদা নিমজ্জিত। এক্ষেত্রে তাঁর নামটাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাখ্যার দাবিদার।

৪.১.১ লালন নামের তাৎপর্য

লালন তিন অক্ষরের রূপক বিশিষ্ট একটি নাম। যে রূপকের অন্তরে রয়েছে এক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান। বংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'লালন' অর্থ 'অতিযত্ন সহকারে পালন; প্রতিপালন, ভরনপোষণ' ইত্যাদি[৪]। দৈনন্দিন জীবনে এটি লালন শব্দের প্রচলিত অর্থ। তবে যদি তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্রত হই তাহলে বলতে হয়, 'লা' কে যিনি 'লন' করেছেন তিনি নালন। 'লা' শব্দের অর্থ মহাশূন্য যা আধ্যাত্মিকতার সর্বচ্ছ স্তর। আর 'লন' বলতে 'জয় করা'কে বোঝায়। এই বিচারে 'লালন' পদের অর্থ 'যে সাধক বস্তুবিশ্বের মোহময় হাতছানিকে জয় করে দেহমনে মহাশূণ্যতাকে গ্রহণ করেন'[৫]। সাঁইজির পূর্বে 'লালন' নামটির উল্লেখ হিন্দু বা মুসলিম কোনো সম্প্রদায় ভূক্ত মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় না। তাছাড়া নামটির আরেকটি মৌলিকত্ব হল, নামটি দ্বারা হিন্দু-মুসলমান যেকোনো ধর্মসম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিকেই নামাঙ্গিকত করা যায়। নামটির সাথে কোনো ধর্ম পরিচয় যুক্ত নেই। তাই অনেকে মনে করেন যেহেতু সাঁইজি নিজেকে দেশ-কাল-সমাজ কিংবা কোনো ধর্ম-পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায়নি, তাই তিনি এই নামটি গ্রহণ করেছিলেন। ভিন্নমতে 'লালন' নামটি সমাজ দ্বারা প্রদত্ত। আসলে সাঁইজির জীবনের গোঁড়ার কথা সুনিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায়না। সম্পূর্ণটাই এক বিতর্ক মূলক বিষয়। কাজেই যদি সাঁইজির জীবনের গোঁড়ার কথা কিছু বলতেই হয়, তাহলে তার সূচনা, সাধন পদ্ধতির আলোচনা হতে করা উচিত। যিনি নিজেই বলেন 'লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান'। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন 'লালন বলে জাতের ফাতা বিকিয়েছি সাধবাজারে'; বাপরে! যেখানে সমাজ বর্ণ-জাতি-ধর্মভেদের নাগপাশে আবদ্ধ, সেই সামাজিক অবস্থায় এমন দাবী তোলা, সত্যি এক দুসাধ্য সাধনা। এখন প্রশ্ন- লালনের মধ্যে এরূপ দার্শনিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ কিভাবে সম্ভব হল? যার উত্তর পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হল।

৪.২. লালন দর্শন : উৎস ও স্বরূপ

লালনের দার্শনিক চিন্তার উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে যার অবদান সবার প্রথমে স্বীকার করতে হয়, তিনি হলেন লালনের গুরু সিরাজ সাঁই। উল্লেখ্য সহজিয়া সাধনায় গুরুর ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে গুরুর আসন ঈশ্বরেরও উর্দ্ধে। সহজিয়া সাধনায় উদ্বুদ্ধ লালনের দর্শনেও এই ভাবাদর্শের ব্যতিক্রম হয়নি। লালন তাঁর গানের ভাষায় বারবার বলেছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে সাধককে প্রথমেই গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করতে হবে। গুরুর পথ নির্দেশ ব্যতীত যে আলেক মানুষের সন্ধান লাভ অসম্ভব, তা লালন বলিষ্ঠ ভাবে বারংবার বলেছেন তার গানের ভাষায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাঁইজি রচিত গানের এক পদ এখানে উল্লেখ করা যায়। সাঁইজি তাঁর এক গানে গুরুপদের মাহাত্মকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন-

'পারে লয়ে যাও আমায়
অমি অপার হয়ে বসে আছি
ওহে দয়াময়'।[৬]

আবার অন্যত্র তিনি গানের ভাষায় বলেছেন-

'যেরূপ মোর্শেদ সেইরূপ রসুল
যে ভজে সে হয় মকবুল
সিরাজ সাঁই কয় লালন কি কুল
পবিনা মোর্শেদ না ভজিলে।'[৭]

এখানে 'মোর্শেদ' বলতে 'সম্যক গুরুর' কথা বল হয়েছে। 'মকবুল' পদের অর্থ 'সফল'। অর্থাৎ এইগানে লালন বলেছেন, 'রসুল' বা 'পরমেশ্বর' এবং 'সম্যক গুরু'-কে অভিন্ন মনে করে যে গুরুকে ভজে সেই সফল হয়; আর যে তা না করে সে ব্যর্থ হয়। কাজেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে গুরুকে অবশ্যই ভগতে হবে। যেমনটি করেছিলেন লালন। কথিত আছে সিরাজ সাঁই-এর কাছ থেকেই দরবেশ দীক্ষা নিয়ে লালন হয়ে ওঠেন, লালন সাঁই দরবেশ। এই দরবেশগন হলেন সূফী সাধক। তাদের সাধনা পারস্য হতে উত্তর ভারত দিয়ে বাংলাতে প্রবেশ করে। সূফী সাধনা ভারতে এসে প্রথমে বৌদ্ধ সহজিয়া ও পরে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার সাথে মিলে মিশে ত্রিবেনী সঙ্গম রচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর

গ্রন্থে বলেছেন- 'ত্রিবেনীতে কেউ কারও বৈশিষ্ট্য হারায়নি, পরস্পরকে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ না করেও সুফী সাধক হয়েছে। দরবেশ দীক্ষা নিয়েছেন। তেমনি বহু মুসলমান স্বধর্ম রক্ষা করেও বৈষ্ণব কবিতা ও গান লিখেছেন। এইভাবে যে সেতু গড়ে উঠেছে তারই নাম বাউল সাধনা। বাউলদের ধর্ম মানুষের ধর্ম'[৮]। এই ধর্মের প্রধান প্রচারক হলেন মহাত্মা লালন ফকির। তাই লালনের বর্ণনায় আমরা বারংবার মানুষ রতনের উল্লেখ পাই। উল্লেখ পাই সহজ সাধনার কথা। কাজেই লালন বর্ণিত আলেক সাঁইয়ের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের সহজিয়া সাধনা ও সূফী সাধনার প্রাথমিক জ্ঞান আরোহন করতে হয়।

৪.২.১ সহজিয়া দর্শন

সহজিয়া সাধনার- প্রাথমিক প্রকাশ আমরা পাই বৌদ্ধ তন্ত্র সাধনায়[৯]। ক্ষণিকতত্ত্ববাদী বৌদ্ধ দর্শনে সবকিছুর ন্যায় মানবদেহকেও ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু যোগ-তন্ত্রে দেহকেই সাধনভূমি বলে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে দেহের মধ্যেই ব্রহ্মান্ডকে দর্শন করা হয়েছে। অনুরুপ ভাবে সহজিয়াগনও দেহের মধ্যে সর্বতত্ত্বের অধিষ্ঠান কল্পনা করেন। তাদের মতে পরমসত্যের অনুসন্ধানে দেহের বাইরে তার অনুসন্ধান অযথার্থ, বরং দেহকে সাধনার মধ্যদিয়েই পরম সত্যের স্বরূপ অনুসন্ধান আবশ্যক। উল্লেখ্য, সহজিয়া দর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে সহজিয়া পদের অর্থটাও জানা আবশ্যক।

৪.২.১.১ সহজ পদের তাৎপর্য

'সহজিয়া সাধনায়' সহজপদের বাচার্থ হল সহজাত। অর্থাৎ যা জন্মসূত্রে লব্ধ তাকেই এখানে সহজাত বলা হয়েছে। সহজিয়া সাধকদের মতে জন্মের সময় মানুষ কেবল বাহ্যরুপ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেনা; তার ভিতরের একটি স্বরুপও তার থাকে। আর এই স্বরূপকেই এখানে 'সহজ' বলা হয়েছে। অপর মতে, যা স্বভাবের অনুকুল তাই হল 'সহজ', আর যা প্রতিকূল তা হল 'বক্র'। প্রথাগত সাধনায় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি গুলিকে সত্য জ্ঞান লাভের অন্তরায় বলে মনে করা হয়। তাই এমতে পরমসত্যের অনুসন্ধানে ব্রত সাধককে সর্বদাই তার সহজাত প্রবৃত্তিকে বর্জন করতে হয়। কিন্তু সহজিয়া সাধকদের মতে সহজাত প্রবৃত্তি গুলি আসলে সত্যজ্ঞান লাভে সহায়ক। তাই এখানে প্রবৃত্তি গুলিকে অবদমনের পরিবর্তে তার চর্চা ও উত্তরনের মধ্যদিয়ে পরমসত্যের সন্ধান করা হয়েছে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গী হতেই এখানে দেহসাধনার কথা বলা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ বৌদ্ধ সহজিয়া স্বীকৃত মৈথুন-সাধন-প্রনালীর কথা বলা যায়। এখানে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনকে মৈথুন-সাধন-প্রণালীর দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দাবী করা হয়েছে 'সমস্ত জৈবিক প্রবাহ নিয়ে আমাদের এই দেহটি আবহমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি'[১০]। এখানে দেহকে ভিত্তি করেই তার ভিতর শিব-শক্তির মিলনকে স্বীকার করা হয়েছে এবং মনে করা হয়েছে, দেহমাঝে শিব-শক্তির মিলনের মধ্যদিয়ে পরমসত্যের জ্ঞান লাভ সম্ভব। কাজেই এই মতানুসারে পরমসত্বাকে উপলব্ধি করতে হলে সাধককে বিশ্বব্রহ্মান্ডে হতে দেহভান্ডে ফিরে আসতে হবে।

৪.২.১.২ বৈষ্ণব সহজিয়াবাদ

সহজিয়া সাধনার আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায় বৈষ্ণব সাধনায়। যার ভিত্তি হল তন্ত্র, যোগ, ও প্রেমের আদর্শ। 'ডঃ সুকুমার সেন সহজিয়া বৈষ্ণবদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধের 'উত্তরাধিকারী' বলিয়াছেন'[১১]। এখন প্রশ্ন- সহজিয়া সাধনায় বৈষ্ণব সহজিয়াবাদের তাৎপর্য কী? 'যা আছে ব্রহ্মান্ডে তাই আছে দেহভান্ডে'- তত্ত্ব ও যোগের স্বীকৃত এই তত্ত্বকেই বৈষ্ণব সহজিয়াগন আরো একটু ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে বলেন- 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। তাছাড়া বৌদ্ধ সহজিয়া দর্শন স্বীকৃত গুরুবাদ, গুহ্য সাধন পদ্ধতি এবং উল্টারীতির ব্যবহারও আমরা বৈষ্ণব সহজিয়া দর্শনে পাই। অর্থাৎ 'বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়াগন ধর্মমতে ও সাহিত্যের আঙ্গিকের ব্যবহারে সর্বত্রই একই আদর্শের অনুসরন করেছে বলা যায়'[১২]। তবে পার্থক্য হল বৌদ্ধ সহজিয়াগন যেখানে প্রকৃতি-পুরুষ মিলনের কথা বলেছে, সেখানে বৈষ্ণব সহজিয়াগন রাধা-কৃষ্ণের মিলনকে সাধনার অঙ্গরূপে উল্লেখ করেছেন। রূপ- প্রেম আনন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত বৈষ্ণব সহজিয়াগন বৈষ্ণবমত ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকে একত্রে মিশিয়ে এবং নিমাই-নিতাইচাঁদের নাম স্মরণ করে প্রেম ধর্মের এক বিচিত্র রূপ নির্মাণ করেছে। এক্ষেত্রে তাদের সাধন-ভজনে দুটি দিক লক্ষ্য করা যায় যথা, মনোমার্গে বিদেহী সাধনা এবং দেহমার্গে মহাসুখ উপলব্ধি। সহজিয়া বৈষ্ণবমতে প্রত্যেক নর-নারীর দৈহিক রূপের মধ্যে সহজ রূপ, তার স্বরূপ নিহিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরুপ এখানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই মতে প্রত্যেক 'নর' রূপ যেমন স্বরুপে কৃষ্ণ, তেমনি প্রতিটি 'নারী রূপ স্বরূপে রাধা। কাজেই রূপের মিলনের মধ্যদিয়ে যখন স্বরপের মিলন ঘটে তখনই আসে অনাবিল আনন্দের অনুভূতি। যা তদের ভাষায় মহাভাব বা সহজানন্দ। বৈষ্ণব সহজিয়াগন কামকে প্রেমে পরিনত করেছেন। তাদের মতে রস ও রতির প্রতীক কৃষ্ণ ও রাধার যে সহজ রাসলীলা তা কেবল স্বর্গের বিষয় নয়, এর সাথে মর্তেরও যোগ আছে। এখানে পৃথিবীর নর-নারী ও আরোপতত্ত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ মানবদেহে সেই রসরতির অপার্থিব স্বরূপকে উপলব্ধি করা হয়েছে। এবং দাবী করা হয়েছে এ স্তরে এসে নর-নারীর আকর্ষণে আর কাম থাকে না, তা প্রেমে পরিনত হয়।

এভাবেই মানব দেহকে এখানে দেবপীঠস্থানে তুলে ধরা হয়েছে সহজিয়া সাধনায়। তবে এ সাধনা মোটেই সরল নয়। এই সাধনা অত্যন্ত কঠিন। সহজিয়াগন এই সাধনাকে 'সাপের মুখে ভেক নাচানো' বলে অভিহিত করে থাকে। অর্থাৎ তাদের মতে এই সাধনা হল কাঙ্খিত বিষয় লাভের আশায় সন্মুখে থাকা লোভনীয় বিষয় হতে লোভ সংবরনের সাধনা। এর জন্য প্রয়োজন দেহ-মনের যথাযথ অনুশীলন ও সদ্গুরুর বা মোর্শেদের দেখানো পথ চলা। লালন ফকির তাঁর ভাব চেতনায় যে এই সহজিয়া সাধনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল সে কথা বলাইবাহুল্য। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন- পরম সত্যের অবস্থান দেহ মাঝে। কাজেই দেহের বাইরে তার অনুসন্ধান না করে বরং দেহকে ধরেই তার স্বরূপ জ্ঞান লাভ করতে হবে। তাই তিনি গানের ভাষায় বলেছেন-

'না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আশমানে
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশান কোণে।'[১৩]

উল্লেখ্য, অনেকেই সহজিয়া সাধনা বলতে সাধারণত রতি ধারণের পদ্ধতিকে বুঝে থাকেন। কিন্তু সহজিয়া সাধনা কেবল রতি ধারণের সাধনা নয়। এই সাধনার মূল লক্ষ্য হল প্রাথমিক স্তরে সহজ হওয়ার বার্তা। সহজিয়াগন মনে করেন, জটিলতার মাধ্যমে সহজমানুষের অনুসন্ধান দুষ্কর ব্যাপার। আসলে পরমসত্য যেহেতু সহজ সরল, তাই তার খোঁজে ব্যকুল সাধককেও এখানে সহজ সরল হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। রবার্ট মেঙ্গের তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'দ্য বাউল অফ বেঙ্গল'- এ দাবী করেন বাউল সম্প্রদায়ের সকল সহজিয়া ক্রিয়া সংরক্ষিত আছে, যৌগিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্মার ভিতর। একে বাউলরা দমের খেলা বলেছেন। যাকে সাঁইজি গানের ভাষায় বলেছেন-

সপ্ততলা ভেদ করিলে হাওয়ার ঘরে যাওয়া হয়
হাওয়ার ঘরে গেলে পরে অধর মানুষ ধরা যায়।

যোগমাগ বর্ণিত ষটচক্রকে বাউল দর্শন সপ্ততলা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যোগ সাধনা অনুসারে কুণ্ডুলিধনী শক্তি জাগরণের মধ্যদিয়ে সপ্ততলা সম্পর্কে জ্ঞান আরোহন ও তার উপরে অবস্থিত সহস্রারকে যদি জানা যায়, তাহলে চেতনার চৈতন্য হয়। জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন হয়। আর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন রূপ অবস্থাকেই লালনের গানে 'অধর মানুষকে ধরার' অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে সহজিয়া মতে যা 'সহজ মানুষ'; কিংবা বাউল মতে যাকে 'মনের মানুষ' বলা হয়েছে, সাঁহিজির দর্শনে তিনিই হলেন 'অধর মানুষ', 'আলেক মানুষ', 'আলেক সাঁই"। তবে এক্ষেত্রে সূফী চিন্তা-চেতনার প্রভাবও অবশ্য স্বীকার্য।

৪.২.২ সূফীবাদ

ভারতে মুসলিম ধর্ম যে তিনটি ধারার মধ্যদিয়ে প্রসার লাভ করেছিল তাদের মধ্যেও অন্যতম একটি সূফী সাধন- সাধনা ধারা। যার ধারক বাহক ছিলেন পীর, ফকির, আউলিয়া, দরবেশগন। সহজিয়া সাধনার ন্যায় সূফী সাধনাও এক গুহ্য সাধন-সাধনা পন্থা। এখন প্রশ্ন সূফী শব্দের অর্থ কী? সূফী কাদের বলে?

৪.২.২.১ সূফী পদের তাৎপর্য

সূফী শব্দের তাৎপর্য নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা মতানৈক্য আছে, যেমন (i) আরবী শব্দ 'স্বফা' ধাতু হতে সূফী শব্দের উৎপত্তি। 'স্বা' ধাতুর অঙ্গ 'পবিত্রতা', এই বিচারে 'সর্ব্ব বিষয়ে অন্তরে বাহিরে পবিত্র ব্যক্তিরাই সূফী'[১৪]। (ii) 'আহ্লু স্ব, স্বুফ্ফহ ' অর্থাৎ 'পর্যঙ্ক পবিষ্ট'- এই বাক্যংশ হতে সূফী শব্দের উৎপত্তি'[১৫]। (iii) গ্রীক শব্দ 'Philosophos' -এর আরবী অপভ্রংশ 'ফয়লহসূফ' অর্থাৎ দার্শনিক হতে সুফী শব্দের উদ্ভব[১৬] (iv) গ্রীক শব্দ 'Sophisma' হতে সূফী শব্দের উৎপত্তি। 'Sophisma' শব্দের অর্থ হল জ্ঞান। যার আরবী অপভ্রংশ হল 'সফসত্বী' অর্থাৎ 'ভ্রান্তকূট' তর্ক'[১৭]। এই বিচারে যে বাক্তি এরূপ কূটতর্কের সহায্য নেয় তাকে সূফী বলে অর্থাৎ 'ভ্রান্তকূট তর্কিক' হতে সূফী শব্দের উৎপত্তি। তবে অধিকাংশ আরবী পন্ডিতদের মতনুসারে আরবী শব্দ 'ইসমু-জামিদ' হতে সূফী শব্দের সৃষ্টি। 'ইসমু-জামিদ'-এর বিশেষ্য হল পশম। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যারা পশমী জামা পরিধান করে, এবং সংসার ত্যাগী তাদের সূফী বলে।

৪.২.৩ সহজিয়া ও সূফীবাদের আলোকে লালন দর্শন

এখন 'সূফী' শব্দের আক্ষরিক অর্থকে ভিত্তি করে যদি আমরা সাঁইজীর দর্শনকে পর্যালোচনা করি তাহলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; যদিও লালন দীক্ষার দিক থেকে দরবেশ ছিলেন, কিন্তু সধনার দিক থেকে তিন ছিলেন বাউল। তাঁর তত্ত্বে বৌদ্ধ সহজিয়া, মুসলিম সুফী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার সার্থক মিলন ঘটেছে[১৮]। সৃষ্টি হয়েছে ত্রিবেণী সঙ্গমের। কাজেই লালন চিন্তা চেতনায় যে আলেক সাইয়ের আসা যাওয়া, তা যে আসলে সূফী সাধনার 'আশিক', কিংবা সহজিয়া বর্ণিত 'সহজ মানুষ-এর ভাব সমন্বিত রূপ একথা বলাবাহুল্য। অন্যভাবে গেলে, সূফী দর্শনে যাকে 'আশিক' বা সহজিয়া মতে যিনি 'সহজ মনুষ' রূপে আখ্যায়িত হয়েছে; লালনের দর্শনে তাকেই মনের মানুষ' বলা হয়েছে। আবার এই 'মনের মানুষ' -কেই সাঁইজি কখনো আলেক সাঁই, অচিন পাখি, দরদী সাঁই, মন-মনুরা বলে আখ্যায়িত করেছেন তার গানের ভাষায়। আসলে হিন্দুর ব্রহ্ম কিংবা মুসলিমের আল্লাহ বা বৈষ্ণবের বাধা-কৃষ্ণের ন্যায় অনামক আদিসত্যকে নির্দিষ্ট কোনো বিশিষ্ট নাম আরোপ করা সাঁইজির স্বভাব নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে লালন বলতে চেয়েছেন পরম সত্য অনামক, তাই তাঁকে যেমন খুঁশি তেমন নামে ডাকা যায়। এখন প্রশ্ন – এই পরম সত্য অনামকের জ্ঞান লাভ কিভাবে সম্ভব? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে লালন দর্শনে গুরুবাদী দেহসাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। লালন সাঁই অজ্ঞাত অনামকের সন্ধান করতে গিয়ে দেহমুখী হয়ে পড়েন এবং যাগ, যজ্ঞ, হোম, তীর্থকে প্রহেলিকা ভ্রমে ত্যাগ করেন। প্রসঙ্গত ভারতীয় দর্শনে পরসত্যের উপলব্ধির পন্থা হিসাবে তত্ত্ব জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু লালন বলেন-

'আত্মারূপে কর্তা হরি
নিষ্ঠা হলে মিলবে তারই ঠিকানা
বেদ-বেদান্ত পড়বি যতরে
তোর বেড়ে যাবে লখনা'[১৯]

আবার আরেক গানের ভাষায় তিনি বলছেন -

'বেদ বিধির পর শাস্ত্র কানা
আরেক কানা হল আমার মন
এসব দেখি কানার হাটবাজার'[২০]

আসলে সাইজি মানুষকে দরদী সাইয়ের প্রতীক বলে মনে করে তাই অজ্ঞাত অনামকের সন্ধানে সে দেহের বাইরে যেতে চায়না। বরং দেহের মধ্যেই তার খোঁজে তিনি ব্যকুল হয়ে ওঠেন। তিনি বিশ্বাস করেন এই দেহতেই অজ্ঞাত অনমক সাঁই লুকিয়ে আছেন, এখানেই অচিন পাখি আনাগোনা করে। তাই সঠিকভাবে প্রাণ দিয়ে তাকে ডাকতে পারলে, এখান থেকেই সে কথা বলে[২১]। কিন্তু এই প্রকৃত সত্য আমরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ। তাই তার সন্ধানে আমরা দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াই, ঘুরে বেড়াই কত তীর্থ স্থান। কিন্তু অবশেষে ব্যর্থ হয়ে আমরা আবার ঘরে ফিরে আসি। তাই লালন প্রক্ষেপ করে বলেন-

'আমি একদিনও না দেখলাম তারে
বাড়ির কাছে আরশী নগর
(সেথা একঘর) পড়শী বসত করে'[২২]

অন্যত্র এই ব্যকুলতা একই ভাবে প্রকাশ পায় যখন তিনি বলেন-

'আপন ঘরের খবর নে না
অনাসে দেখতে পাবি কোন খানে সাঁইর বারাম খানা'[২৩]

কিংবা যখন তিনি বলেন

'হাতের কাছে হয়ন খবর
কী দেখতে যাও দিল্লি লাহোর
সিরাজ সাঁই কয় লালন তোর
সদাই মনের ঘোর গেল না'[২৪]

আসলে সব কিছু আমার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আমরা তার কদর করিনা। ওপারের বিচার পাবার আশায় আমরা যে কতকিছু ত্যাগ করছি তা আমরা নিজেরাই জানি না। কিন্তু ওপারে যিনি আছেন এপাড়েও তো সেই তিনি আছেন। কাজেই এপাড়ের কাজ ফেলে ওপারে যওয়া যে সম্ভব নয় তো বোঝাতে গিয়েই সাঁইজি গান ধরেন-

'দিন থাকিতে দ্বীনের সাধন
কেন করলে না
সময় গেলে সাধন হবে না'[২৫]

উপসংহার (Conclusion)

লালন সাঁইজীর গানের মর্মার্থ অনুসন্ধানের মধ্যদিয়ে স্বরুপের যে আলোচনা আমরা পাই তা হতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে; লালনের দর্শনে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্ঠা নিহিত, তাই দেহের স্বরুপ উপলব্ধীর মধ্যদিয়েই এখানে আত্মজ্ঞান অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এখানে দেহকে এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কারণ, বাউল মতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানব। অতএব ঈশ্বরকে জানতে হলে তার স্বাক্ষাৎ লাভ করতে হলে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের স্বরুপকে জানতে হবে। তাই মানুষের রহস্য উদঘাটনে তারা নিজেকে করেছে, সদা নিমগ্ন। আর এই চিন্তা চেতনার প্রভাবেই আমরা পাই লালন দর্শনে। মানুষকে ভজন করতে গিয়ে লালন মূলাধার রূপে দেহকে গ্রহণ করছে। অর্থাৎ লালনের মতে মনের মানুষ, আলেক মানুষ, অচিন পাখি- মানব দেহের মধ্যেই বিরাজ করে। প্রয়োজন শুধু তকে ধরা। তাই তিনি গানের ভাষায় বলেন- 'ক্ষ্যাপারে তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়'। অর্থাৎ মুক্তি পেতে গেলে, পরম সত্যের সন্ধান পেতে গেলে আগে আপনাকে জানতে হয়। যা কার্যত আমাদের কাছে অসাধ্য। তাই রহস্যময় অনামকের লুকচুরি খেলায় বিস্ময় আবিষ্ট হয়ে লালন গান বাঁধে-

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়।'[২৬]

এখন প্রশ্ন- এই গানের মধ্যদিয়ে লালন কি বলতে চেয়েছেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের গানের ছত্রে ব্যবহৃত রূপকের অর্থবোধ আগে প্রয়োজন। উক্ত গানে দেহের রূপক স্বরূপ খাঁচা এবং আত্মার প্রতীক হিসাবে অচিন পাখি পদের ব্যবহার। বাউলমতে পরমাত্মা হাওয়া রূপে দেহের মধ্যে যাওয়া আসা করে। তাই বাউলদর্শনে আত্মার রূপক হিসাবে 'পাখি' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা হয়। এই 'পাখি' স্বরুপ আমাদের কাছে অজ্ঞাত, অজানা হওয়ার পালন তাকে 'অচিন পাখি' বলে বর্ণনা করেছেন। তবে আরেক মতে পাখিটা এখানে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ারূপী অন্তর সত্তা। শ্বাস নেওয়া আবার তা ছাড়া- এভাবেই জীবন ক্রিয়া চলছে। আর যখনই তাতে ছেদ পড়ে, তখনই মৃত্যু নেমে আসে। এই আসা যাওয়ার খেলা এক রহস্যময় বিষ্ময়কর বিষয়, যা আমাদের সকলের অজ্ঞাতে ঘটে চলেছে। লালন এই রহস্যকে জানতে চেয়েছে এবং এই কৌতুহল সবার মাঝে জাগিয়ে তুলতেই গানের প্রথম লাইনের উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন- এই রহস্যের উদঘাটন কিভাবে সম্ভব ? যার উত্তরে তিনি গানের দ্বিতীয় লাইনে বলেছেন- 'ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়'। উল্লেখ্য, 'বেড়ি' পদের অর্থ হল শিকল, কাজেই মনোবেড়ি বলতে এখানে মনের শিকল বা প্রেমময় সম্পর্কের কথা সাঁইজি এখানে বলেছেন। অর্থাৎ এই গানের মধ্যদিয়ে সাঁইজি যে আত্মতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন তা হল- পরমাত্মার বিরাজ দেহভান্ডে। তাই দেহসাধনা, প্রেম ভক্তির মধ্যদিয়ে তার সন্ধান করতে হয়। তাকে ধরার সেই করাতে হয়। আরা যদি এই অধরাকে ধরা যায়, তাহলেই আপনার মধ্যে আপনাকে জানা যায়। তবে পরমাত্মার এই সহজ জ্ঞান আমাদের না থাকার জন্য তার স্বরুপ সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত। যার ফলস্বরুপ সে আমাদের কাছে অচিন পাখি। এই অচিন পাখির সন্ধানে লালনের যে ব্যকুলতা, তা প্রকাশ পায় তাঁর আরেক সৃষ্টি-

মিলন হবে কতদিনে
আমার মনের মানুষের সনে-

এই গানটির মধ্যনিয়ে। এখানে গানের ভাব কিন্তু সেই পরমাত্মার উপলব্ধি, তাকে জানার চেষ্টা। এখানেও সাঁইজি পারমাত্মাকে 'মনের মানুষ' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। আসলে শব্দ একটি ভাব, যার পশ্চাতে থাকে একটি বস্তু। আর এই বস্তুকেই আমরা নাম দ্বারা চিহ্নিত করে থাকি। কাজেই নামের মধ্যে কোনো শক্তি নেই; যদি না তার ভেতরের বস্তু ও তার স্বরুপকে আমরা জানতে পারি। আর যদি তা জানা যায় তাহলে শব্দের খোঁসা ছেড়ে শাঁস বেড়িয়ে আসব। যার জন্য লালন বলেছেন- 'যখন নিঃশব্দ শব্দকে খাবে'। অতএব এটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা, যে মূল প্রশ্নটির উত্তর এই প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে- মনের মানুষ কে? সেই মনের মানুষ আসলে মানবদেহাশ্রিত পরম সত্তা বা আত্মা। এই প্রসঙ্গে

শশিভূষণ দাশগুপ্তের অভিমত হল- উপনিষদের ‘পরমাত্মা’, সহজিয়াদের ‘সহজ’, সূফীদের ‘প্রিয়তম’ এর মিলিত রূপ হল লালনের ‘মনের মানুষ’২৭।

তথ্যসূত্র **(Reference)**

১/চৌধুরী,আ.জানুয়ারি ২০১৪. লালন সমগ্র, পাঠক সমাবেশ, ১৭ ও ১৭/এ (নিচতলা) আজিজ মার্কেট শাহবাগ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১৯৮.
২/ ‘মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার আহার ব্যবহার থাকায় অনেকে তাহকে মুসলমান মনে করিত। বৈষ্ণব ধর্মের মত পোষণ করিতে দেখিয়া হিন্দুগন তাঁহাকে বৈষ্ণব ঠাওরাইত।' ... রায়,অ.অগ্রহায়ণ ১৪২৭.লালন ফকির ও তার গান, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩,প্রথম 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্করণ,ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ২।
৩/ প্রাগুক্ত, ১, পৃ. ১৫০।
৪/ প্রাগুক্ত, ১, পৃ. ১৬০।
৫/মাননান,আ.বইমেলা-২০২১.লালনদর্শন,রোদেলা প্রকাশনী,প্যারিদাস রোড (বাংলাবাজার),ঢাকা-১১০০,প্রথম প্রকাশ,চতুর্থ মুদ্রণ, পৃ.২৩।
৬/ প্রাগুক্ত, ১,পৃ. ১৭৬।
৭/ প্রাগুক্ত, ১,পৃ. ১৯৯।
৮/ প্রাগুক্ত,২,পৃ.২২।
৯/ ‘বৌদ্ধ তন্ত্রযান বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল- বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান' ... চক্রবর্তী,জা.মার্চ,২০০৫.চর্যাগীতির ভূমিকা, ডিএম, লাইব্রেরি, ৪২ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬,প্রথম প্রকাশ- রথযাত্রা,পৃ.১৯।
১০/ড.দাশগুপ্ত; শ. (অনুবাদক: গোপীমোহন সিংহরায়).২০১৫,বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধন, বাংলা সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা, কলকাতা: ভারবী, পৃ.৪৮.
১১/ প্রাগুক্ত,৯,পৃ.৯৬।
১২/ প্রাগুক্ত,৯,পৃ.৫৮।
১৩/ প্রাগুক্ত,১,পৃ.২০০।
১৪/ ড.হক,মুহাম্মদ এ.২০১৫,বঙ্গে স্থূফী প্রভাব, র্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০,প্রথম র্যামন প্রকাশ,চতুর্থ মুদ্রণ,পৃ.২৪।
১৫/প্রাগুক্ত,১৪।
১৬/প্রাগুক্ত,১৪।
১৭/প্রাগুক্ত,১৪।
১৮/ 'মূল স্রোতটি আমার বিশ্বাস বৌদ্ধ সহজিয়া। তার দুটি দিকে মুসলিম সূফী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারা। লালনের সাধক জীবনে ও সৃষ্টিতে তিনটি প্রবাহ একসঙ্গে মিলেছে’ প্রাগুক্ত, ২,পৃ.১৯।
১৯/প্রাগুক্ত, ১,পৃ.১৯৬।
২০/প্রাগুক্ত, ১,পৃ.১৯০।
২১/ ‘মানুষ হাওয়ায় চলে, হাওয়ায় ফেরে, মানুষ হাওয়ার সাথে রয়। দেহের মাঝে আছেরে সোনার মানুষ ডাকলে কথা কয়’ প্রাগুক্ত, ১৪,পৃ.৭০।
২২/প্রাগুক্ত, ১,পৃ.১৫৪।
২৩/প্রাগুক্ত, ১,পৃ.২৭০।
২৪/প্রাগুক্ত, ১,পৃ.২০০।
২৫/প্রাগুক্ত, ১,পৃ.২২০।
২৬/ প্রাগুক্ত, ১,পৃ.২৪০।
২৭/ ‘বাউল সম্প্রদায়ের ভাবের মানুষের কল্পনায় উপনিষদের পরমাত্মা, সহজিয়াদের সহজ ও সূফীগনের দিওয়ানার কল্পনার অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছে’ ... প্রাগুক্ত,১০,পৃ.৭২।